



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 62 - 71

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সমীর চক্রবর্তী ও উত্তরবঙ্গের আধুনিক বাংলা কবিতা

ড. সুবীর বসাক

সহকারী অধ্যাপক

অদ্বৈত মল্লবর্মান স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

অমরপুর, গোমতী, ত্রিপুরা

Email ID : subir.bangla@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024

Selection Date 20. 07. 2024

Keyword

Modern Bengali poetry of North Bengal, Personal life of Samir Chakraborty, Partition, Refugee, Naxal Movement, Style, Direction, Separate discourse.

Abstract

Modernity entered the Bengali poetry of North Bengal during the post-independence period. In the pre-independence era, Bengali poetry here followed Rabindra. The main reason for this is the peaceful lifestyle of North Bengal. The major historical events of the pre-independence period such as the anti-partition movement, the First and Second World Wars, the Non-Cooperation Act, the Quit India Movement, etc. did not affect North Bengal that much. Even Western intellectualism, individualism, decay of social values, unemployment, depression, loneliness which formed the mindset of modern poetry were not so active in North Bengal. Therefore, till the 1950s, the poets of North Bengal wrote love-nature and romantic lyrical poems. The social conflict was not so evident in their writings.

From the 1950s onwards, the poets of North Bengal became increasingly obsessed with the complexities of life. Already many expected independence dreams have been broken due to the pain of partition. As a result of partition, lakhs of refugees started taking shelter in different parts of North Bengal. As a result, there was a radical change in demographics. On the other hand, the trend of social movement which had mainly influenced North Bengal through Tevaga since the pre-independence period became more intense during this period. The impact and reaction of various programs of mobilizing the people of Leftist parties, food movement, farmers movement, railway workers movement, tea workers movement, Naxal movement etc. endangers the poets of North Bengal. Along with the improvement of communication with Kolkata, the capital of West Bengal, the administrative needs of the capital with the districts, the expansion of education, the ideas of modern poetry began to gain clarity in the intellectual circles of North Bengal.

As a result, modern Bengali poetry gradually began in the beginning of the sixties. And in this case Samir Chakraborty was the foremost poet. The signs of modernity are evident in his poetry as well as in his style. In Samir Chakraborty's poetry, the social problems like partition, refugee life suffering, Naxal movement etc. come directly. He has managed to create his own path and



scope both in terms of style and language. It is through him that the Bengali poetry of North Bengal abandoned the old style and advanced in the direction of modernity.

Discussion

উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবেশ ঘটেছে স্বাধীনতা উত্তর কালে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে এখানকার বাংলা কবিতায় ছিল রবীন্দ্রানুসরণ। এর প্রধান কারণ উত্তরবঙ্গের শান্ত জীবনপ্রবাহ। প্রাক-স্বাধীনতাপর্বের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ-আইন অমান্য-ভারত ছাড়া আন্দোলন ইত্যাদির সামাজিক অভিঘাত উত্তরবঙ্গকে ততখানি প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-দর্শন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকারত্ব, হতাশা, নিঃসঙ্গতা যা আধুনিক কবিতার মননভূমি তৈরি করেছিল তা উত্তরবঙ্গে ততখানি ক্রিয়াশীল ছিল না। তাই পাঁচের দশক পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কবিরা প্রেম-প্রকৃতি ও রোমান্টিক ভাবনামূলক লিরিকধর্মী কবিতাই রচনা করেছেন। সামাজিক অভিঘাত তাঁদের রচনায় ততখানি পরিস্ফুট হয়নি। ১৯৫২-সালের স্মৃতিচারণায় সুরজিত বসু লিখেছেন,

“আমরা যখন ‘জলাক’ বের করা শুরু করি তখন আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে জলপাইগুড়ির তরুণ-তরুণী তথা মধ্যবিত্ত সমাজের মনে ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিল, চেতনা ছিল খুবই দুর্বল। আসলে আধুনিকতা, নাগরিকতা, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি সাহিত্যিক লক্ষণগুলি জলপাইগুড়ির জীবনে তখনও পরিস্ফুট হয়নি।”^২

এই সময়ের উত্তরবঙ্গের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, পরেশ সোম, জগন্নাথ বিশ্বাস, বেণু দত্তরায়, অপরাজিতা গোস্বামী, সবিতা দেবী, নীরজ বিশ্বাস, প্রবোধচন্দ্র পাল, অমিত গুপ্ত, প্রমোদ সাহা, সুরজিত দাশগুপ্ত প্রমুখেরা। বলা চলে এই সব কবিরা রাবীন্দ্রিক ভাবনার খুব কাছাকাছি ছিলেন। তাঁদের কবিতায় যতটুকু সামাজিক সংঘাতের কথা এসেছে তা মূলত নজরুল-সুকান্তদের প্রতিবাদী কণ্ঠে। আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মযন্ত্রণা তাতে ছিল না।

পাঁচের দশক থেকেই উত্তরবঙ্গের কবিরা ক্রমশ জটিল জীবনযন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যেই বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে গেছে দেশভাগের বেদনায়। দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ আশ্রয় নেওয়া শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। ফলে জনবিন্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটে। উদ্বাস্তু মানুষের যন্ত্রণা, মাথাগোঁজার জবরদখল লড়াইয়ের পাশাপাশি দুটি ভিন্ন ধারার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনও সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই যে সামাজিক আন্দোলনের ধারাটি মূলত তেভাগার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেছিল এই সময়ে তা আরো পল্লবিত হয়ে ওঠে। বামপন্থী দলগুলির মানুষকে সংঘটিত করার বিভিন্ন কর্মসূচী, খাদ্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, রেল-শ্রমিক আন্দোলন, চা-শ্রমিকদের আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন ইত্যাদির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উত্তরের কবিকুলকে বিপন্ন করে তোলে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার সাথে যোগাযোগের উন্নতি, জেলাগুলির সাথে রাজধানীর প্রশাসনিক প্রয়োজন, শিক্ষার প্রসারের ফলে উত্তরবঙ্গের বুদ্ধিজীবী মহলে আধুনিক কবিতার চিন্তাসূত্রগুলি ক্রমশ স্পষ্টতা পেতে থাকে। তাঁদের ভাবজগতে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, ইয়েট্‌স্‌, এলিয়ট, মালার্মে, প্রুস্ত, রিল্‌কে, লরেন্স একই সাথে ভিড় করে আসে। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গে বিকাশ ঘটে আধুনিক বাংলা কবিতার। আর উত্তরবঙ্গের আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় সমীর চক্রবর্তী এক প্রবাদ প্রতিম পুরোধা পুরুষ।

সমীর চক্রবর্তীর জন্ম ৩১-এ মে, ১৯৩৭ ভূটানের ফুন্টশোলিং শহরের জয়গাঁ চা-বাগানে। ক্লাস থ্রি-তে পড়ার সময় থেকেই তাঁর কবিতাচর্চার শুরু। কবিতাচর্চার প্রাথমিক পাঠ পেয়েছিলেন মা ও মাসির কাছ থেকে। কবির বাবা ছিলেন বক্সা ডুয়ার্স টি কোম্পানীর কর্মচারী। নেশা জাগানো ডুয়ার্সের মনোময় প্রকৃতি ছোট থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক গড়নটি তৈরি করে দিয়েছিল। প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে তিনি ভর্তি হন ম্যাকউইলিয়াম হাই স্কুলে। তখন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সান্নিধ্যে আসা। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে হাতে খড়ি। ১৯৫১-তে



কোচবিহারে সংঘটিত খাদ্য আন্দোলনে লাল বাগা হাতে হেঁটেছিলেন মিছিলে, কখনো কৃষক সমাবেশে ভলান্টিয়ারী হয়ে, কখনো নির্বাচনের কাজে কর্মী হয়ে বেড়িয়েছেন পথে প্রান্তরে। ম্যাকউইলিয়াম থেকে কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলে ভর্তি হন নবম শ্রেণিতে। সেখানেও পড়াশুনার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ভর্তি হন জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে। তখন সেখানে গড়ে উঠেছিল ‘রূপায়ণ’ নামে একটি সাহিত্য গোষ্ঠী। সুরজিত বসু, সুরজিত দাশগুপ্ত, কার্তিক লাহিড়ী, দেবেশ রায়, গণেশ চন্দ্র রায়, অর্ণব সেন, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও ছিলেন এই গোষ্ঠীর সদস্য। এই সাহিত্য গোষ্ঠীর যে কয়েকজন পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন - দেবেশ রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সমরেশ মজুমদার, সমীর রক্ষিত প্রমুখেরা। আনন্দচন্দ্র কলেজে পড়াকালীন তিনি প্রবলভাবে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন ফলে পড়াশুনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তাই আনন্দচন্দ্র কলেজ ছেড়ে চতুর্থবর্ষে ভর্তি হন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে। সেখানে একে একে বিষ্ণু দে, সমর সেন, সমরেশ বসু, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের সান্নিধ্যে আসেন। বি.এ. পাশ করার পর তাকে কখনো কৃষক সমিতির কাজে, কখনো নির্বাচনের কাজে জলপাইগুড়ির গয়েরকাটা, ফালাকাটা প্রভৃতি অঞ্চলে কমরেডদের সাথে গ্রাম পরিক্রমা করতে হয়েছিল। ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন ও ১৯৬৫-তে ভারত রক্ষা আইনে কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এম. এ. পাশের পর তিনি ম্যাকউইলিয়াম স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিতে নিযুক্ত হন।

সমীর চক্রবর্তী খুব অল্প বয়স থেকে কবিতা চর্চা করলেও আমরা তাকে মূলত ছয়ের দশকে কবিই মনে করি। উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রানুসারী মানসিকতা থেকে মুক্ত করে আধুনিকতার দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করানোর প্রথম কারিগর বলা যেতে পারে সমীর চক্রবর্তীকে। কেননা লেখালেখির প্রথম থেকেই কবিতার বিষয়ের পাশাপাশি রীতিটিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— ‘হাঙরের ঢেউ আঙনের সৈঁক’ (১৯৬১ তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে যুগ্মভাবে), ‘হলুদ ঘাসের অমনিবাসে’ (১৯৮৪), ‘শীত ও ক্ষুধার গল্প’ (১৯৮৪), ‘হেঁটে যাচ্ছে আত্মবাহক’ (১৯৮৭) ইত্যাদি।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে ‘হাঙরের ঢেউ আঙনের সৈঁক’ প্রকাশের পর লেখেন ‘শীত ও ক্ষুধার গল্প’, ‘হলুদ ঘাসের অমনিবাসে’ এবং ‘হেঁটে যাচ্ছে আত্মবাহক’। ‘হলুদ ঘাসের অমনিবাসে’র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬২ - ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ। সমীর চক্রবর্তীর কবিতায় সমাজের কথা প্রখরভাবে উপস্থিত কিন্তু তা কখনোই শিল্পবোধ বিচ্যুত স্মার্ট সাংবাদিকতা হয়ে ওঠেনি। ডুয়ার্সের পাহাড়-অরণ্য-নদীর কূলে বসে কবিতা চর্চা করেছেন বলে তাঁর কবিতা নিছক প্রকৃতি মুগ্ধতার কথা হবে— তেমন অনুভবকে সপাটে আঘাত করে কবিতাকে নিয়ে আসেন সমাজের প্রকৃত প্রান্তরে—

“সে এখন ডুয়ার্সের থ্যালিয়ামীয় জ্যোৎস্নার দিকে

চকাস করে একটা চুমু ছুঁড়ে দিয়ে

বলতে পারে না—

আহ, আমার রক্তের মধ্যে মিশে যাও

শাদা দুধের মতো -

নিজেকে প্রবাহিত করো অনন্তকাল—

আমার জোড়া ফুসফুস

ও হৃদয় - পিণ্ডের মধ্যে

হেঁকেনাও কুয়াশার আন্তরণ—”^২

যে প্রান্তরে প্রতিনিয়ত রক্ত হয়ে ঝরে মানুষের বেদনা, হাহাকার; সেই প্রান্তরেই ধূর্ত সমাজ শিকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের ভণ্ডামি কবির কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। সমস্যার প্রকৃত সমাধান না করে শুধুমাত্র ধামাচাপা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখার রাজনীতির বিরুদ্ধে কবি বলে ওঠেন—

“শাদা অ্যাপ্রনপরা সিস্টার

পায়ের নিচের কফ থুথু মাড়িয়ে



রোজ রোজ শাদা কাপড়ে ঢেকে দিচ্ছে

শাদা শরীর

দেওয়ালের পেরেকে বুলিয়ে রাখছে

টাউস টাউস দিন ও ঘামের গন্ধ”^৩

এখানে ‘শাদা অ্যাপ্রনপরা সিস্টার’ সেই চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন- যার হাতে দেশসেবার ভার অর্পিত। ‘কফ’ ও ‘থুথু’ হয়ে ওঠে ছিন্নমূল উদ্ভাস্তর দল। অবস্থার উন্নতিকরণের পরিবর্তে উদ্ভাস্তদের ক্রমশ মৃত্যুমুখে পর্যবসিতকরণের আভাস ব্যবহৃত কবিতাটির তৃতীয় চরণে। আপাত শান্তির বাণী শোনানো দেশনেতা প্রকৃত সমস্যার সমাধান না করে দেওয়ালের পেরেকে ব্যবহৃত পোষাকের মতো সমস্যাকে বুলিয়ে রাখছে। আসলে সমীর চক্রবর্তী যাবতীয় সময় পরিধিতে অবস্থান করেই সময়কে আঘাত করেন নিরপেক্ষ দূরত্ব বজায় রেখে।

সমীর চক্রবর্তীর কবিতায় প্রবলভাবে এসেছে দেশভাগের কথা। যাঁদের সম্মিলিত যোগদানে স্বাধীনতার বিজয়কেতন আকাশে উড়েছে, রাজনৈতিক কুটিল আবর্তে তাঁরাই চাপা পড়েছে রথচক্রে। দেশভাগের যন্ত্রণার সব থেকে বেশি শিকার সেই প্রান্তজনেরাই। অথচ ইতিহাসে আজ যারা স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন দেশভাগের পিছনে তাঁদের মূর্খামিকে অস্বীকার করা যায় না কোনোভাবেই। তাই কবি লিখলেন—

“আমরা, খাঁচা ভাঙ্গবার মাশুল গুনেছি

নিজেরা ঢুকেছি খাঁচায়

শব্দের গন্ধে অতল অন্তরীণ—

তুমি নির্ভুল ট্রিগার টিপেছো

রক্ত সিক্ত মাচায়—

আমরা দিয়েছি মায়ের বোনের ইজ্জত

ঘর বেঁধেছি নরক-মড়ক-পাহাড়ে বিলে

মন্ত্রী, তুমি হে গলায় পরেছ

আজাদীর লাল ফিতা”^৪

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের মাটিতে লক্ষ লক্ষ উদ্ভাস্তর বিতারিত হবার নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে সমীর চক্রবর্তীর কবিতায়। এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি চিত্রকল্প তুলে ধরা হল—

১. “হে মহামন্ত্রী, তৃষ্ণার জলদেবনা

ওঠাবে গুঁতিয়ে ভোরের ট্রেনে—

নইলে আঁধার ক্যাম্পে চালাবে গুলী—

গা’ব ক’রে দেবে লাশ?”^৫

২. “জ্বলছে কুটির

জ্বলছে বাড়ি

আগুনে গনগন

টেলিভিসনে

দেখছি আমার

মায়ের ধর্ষণ!”^৬

৩. “আমি কি তোমার ন্যাংটো প্রতিবেশী?

স্পেশাল ট্রেনে পাঠিয়ে দেবে সেই দণ্ডক বনে

যেখান থেকে সদ্য ফিরে আসা!”^৭



সমীর চক্রবর্তীর কবিতায় শ্রেণীবৈষম্যের কথা নানাভাবে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথা তখনো উচ্ছেদ হয়নি। একদিকে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি, বর্গাচাষি অন্যদিকে জমিদার এই অঞ্চলে প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে থাকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী তেভাগা আন্দোলনের সময়কাল থেকে। দেশভাগের ফলে অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের আগমনে সেই সংকট আরো জমাট বাঁধে। যুযুধান দুই পক্ষের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় সমস্যা যে সম্পদ বন্টনের অনিয়ম, তাকেই কবি ভুলে ধরেছেন ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে—

“তোমার বদহজম সে তো বেশি খাওয়ার জন্য
আর আমারও বদহজম
সে কেবল না খেতে পাওয়ার জন্যে
এক কাজ করি প্রভু
আমি ছেঁতাই ক’রে নিয়ে আসি
পাঁচ মন শুয়োরের মাংস
তুমি গাভে পিঙে গেলো
আমি তোমার চর্বি চাটি”^৮

প্রাকৃতিক নিয়মেই একপাশে জোয়ার এলে অন্য পাশে আসে ভাঁটা। কৃষিপ্রধান উত্তরবঙ্গে আবাদি জমির বেশিরভাগটাই জমিদারের কুক্ষিগত হলে সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বাভাবিক কারণেই শোচনীয় হয়ে ওঠে। সর্বব্যাপী অসহনীয় ক্ষুধার চিত্র বাংলা সাহিত্যে নতুন কোন বিষয় নয় তথাপি এই অঞ্চলের বাস্তবতাকে অনুধাবনে সেই চিত্র সহায়ক হবে—

“বা হাতের প্রচন্ড থাবড়ায়
ছেলের কাঁরানো মুখটাকে
সেলাই ক’রে দিই জন্মের মতো
উঃ কি অসহ্য ওই ক্ষুধার চিংকার
সারাটা বর্ষা পেট ফাটিয়ে কেঁদেছে
ওই ভিতরের বাচ্চা”^৯

এমতবস্থায় দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বা সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন কবির মাথায় কাজ করে না। বরং সন্তান-সন্ততিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দু’মুঠো অন্নের জোগানই প্রাথমিক কর্তব্য ও প্রত্যাশা হয়ে ওঠে—

“আহা, শুধু একটিবার
অজস্র খাবারের গন্ধে
ম’ ম’ করে উঠুক আমার হাজার-দুয়ারী
আমার বউ-বাচ্চার ন্যাংটো পিঠ ও পেটের ওপর
সুড়সুড়ি দিক অন্ধকারের ওম”^{১০}

নিরন্ন মানুষ, উদ্বাস্ত জীবন-কথা, শ্রেণী বৈষম্য, রাজনৈতিক ভণ্ডামির চিত্র বারে বারে উঠে এসেছে সমীর চক্রবর্তীর কবিতায়। নিরন্ন ক্ষুধাতুর মানুষের যন্ত্রণায় কবি কাতর হয়ে ওঠেন বলেই স্বপ্নবিলাসী সৌন্দর্যময়তাকে ভুলে যান—

“মানুষের কষ্ট হলে এরকম ঘোর লাগে
বুক ভ’রে অক্সিজেন নিতে কষ্ট হয়
বড় কষ্ট হয়, রক্তপাত হয়
ফুল ভালোবাসতে”^{১১}

সমীর চক্রবর্তীর কবিতায় দেশভাগ, উদ্বাস্ত জীবনকথার পাশাপাশি নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গও এসেছে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (CPI) বিভাজন ঘটে ভারত-চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। CPI থেকে বেড়িয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (CPI-M) (মার্ক্সবাদী) দলটি শোধানবাদী আখ্যায় ভূষিত হয়। পরবর্তীকালে ‘নয়া শোধানবাদী’ রূপে সংসদীয় গণতন্ত্রের



প্রতিস্পর্ধী CPI-ML নামক নতুন দল গঠিত হয়। মূলত চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল, কানু সান্যাল প্রমুখদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে কৃষক জাগরণের মধ্য দিয়ে তারা বৈপ্লবিক চেতনার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিল। কেননা যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী) দলটি ইতিমধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টির মূল আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে। তাই ‘নয়া-শোষণবাদী’ CPI-ML-এর কাছে CPI-M এবং কংগ্রেসের মধ্যে কোনো ফারাক ছিল না। এই ‘নয়া-শোষণবাদী’ দলটিই ইতিহাসে মূলত নকশালপন্থী নামে অভিহিত। ১৯৬৭-তে শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে নকশালবাড়ি এলাকায় সংঘটিত কৃষক জাগরণের আগে থেকেই নকশালবাড়ি চেতনা বিস্তার লাভ করতে থাকে। সম্ভবত ভারতে স্বাধীনতার আগে এবং পরে তেভাগা আন্দোলন ও তেলঙ্গানা আন্দোলন ছাড়া আর কোনো সশস্ত্র সংগ্রাম এতোখানি বিস্তার লাভ করতে পারেনি। নকশালপন্থী চিন্তা-চেতনা সেই সময়ে শহুরে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত যুবমানসে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য প্রতিভাবান তরুণ, চাকুরিজীবী শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষ সুখী জীবনের হাতছানিকে অবলীলায় বিসর্জন দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে নকশালদের কার্যকলাপ অজস্র গল্প-কবিতা-উপন্যাসে ধরা আছে। উত্তরবঙ্গে ছয় ও সাতের দশকে যারা কবিতা লিখেছেন তাঁদের লেখনিতে সেই চিত্র দুর্লভ নয়। ছয়ের দশকের কবি সমীর চক্রবর্তীর কবিতায় ধরা পড়েছে নকশালদের কার্যকলাপের চিত্র—

“প্রতিদিন ট্রেন থেকে নেমে
 ফের তিনি চলে যান পরবর্তী ট্রেনে
 কোনো নামের আড়াল খুঁজে
 সমুদয় অ্যানাটমী বন্ধ করে দিয়ে যান।”^{২২}

এই কবিতায় ভৈরব মহাস্তি নামক জনৈক নকশাল নেতার ছদ্মবেশ পুলিশের সাথে লুকোচুরি খেলা চিত্রিত হয়েছে ‘সমুদয় অ্যানাটমী বন্ধ করে’ দেওয়ার চিত্রকল্পে। পাশাপাশি রয়েছে পুলিশি নির্মমতার চিত্রও—

“অকস্মাৎ শাল কদমের বন থেকে
 ছুটে আসে কালো বাঘ
 ঘাস ঝোপে সারাঙ্কণ ডাকে
 মহান নির্দেশে
 সমস্ত ছাপিয়ে কার
 হুকুমের শব্দ ভেসে আসে
 অ্যাটেনশান প্লিজ!”^{২৩}

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের পুলিশি নির্মমতার এরূপ প্রত্যক্ষচিত্র বাংলা কবিতায় দুর্লভ। সমীর চক্রবর্তী কবিতায় সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাতের পাশাপাশি প্রেমের কথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই প্রেম চেতনা নিছক রোমান্টিকতায় আবদ্ধ নয়। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতার তুলনায় বাস্তবতারই প্রাধান্য বেশি। ফলস্বরূপ প্রেমের আবেগের তুলনায় বুদ্ধিমত্তাই অধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কেননা আবেগতাড়িত প্রেমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরহের দহনযন্ত্রণা জুড়ে থাকে। পরিণতির কথা স্মরণে রেখে কবি তাই শুরুতেই পরিষ্কার করে নিতে চান প্রেমের পথ-পরিধি—

“শুরুতেই ঠিক হয়ে যাওয়া ভালো
 হয় উল্টোপথে হেঁটে গিয়ে ছুঁইয়ে ফেলবে চাঁদ
 নষ্টফল, কিম্বা গৃহস্থের সাজানো আহ্লাদ।”^{২৪}

কবি জানেন প্রেমের আকর্ষণ সর্বদা একই রকম থাকে না। যতদিন যায় প্রেমের আকর্ষণ ততই গাঢ় হয়— এই রকম একটি ভ্রান্ত ধারণাকে তিনি কখনোই প্রশ্রয় দেননি। বরং জীবনের রুঢ় বাস্তবতায়, সামাজিকতার টানাপোড়েনে প্রেম কতখানি জীবন্ত থাকতে পারে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সন্দ্বিহান—

“তুমি কি প্রেমিক থাকো ততদিন?
 ভবঘুরে নদী, নিমজ্জমানতা ও নীলমোহনার মধ্যে



তুমি কি প্রেমিক থাকো”^{১৫}

সমীর চক্রবর্তীর অনেকগুলি কবিতায় এসেছে মৃত্যুচেতনার কথা। যদিও তাঁর কবিতায় সামাজিক অভিঘাত প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। স্বাধীনতা, দেশভাগ, নিরন্ন মানুষের আর্তনাদ তাঁর চেতনাকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে। তিনি যে সময়ে বসে কবিতা লিখেছেন, সেই সময়টা ছিল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী সময়। তথাপি তিনি তাঁর বিশ্বাসের ভিতকে নড়বড়ে হতে দেননি কখনোই। তিনি জানেন মানবজীবনে আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু কিন্তু তারও উর্ধ্ব রয়েছে অনন্ত জীবন পরিক্রমা। তাই তিনি লেখেন—

“শতক দেখেছি আমি প্রাক্তন রূপের শিকড়ে

জরা মৃত্যু সহোদর, তবুও আরেক অঙ্গীকার

অংগের শোণিতে আছে।”^{১৬}

সেই বিশ্বাস নিয়েই পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন ‘হেঁটে যাচ্ছে আত্মবাহক’ কাব্যটি। যেখানে কবি নীলকণ্ঠের মতো সমাজোখিত যাবতীয় গরলকে ভক্ষণ করে হয়েছেন নীলকণ্ঠ। কবি এখানে দর্শক মাত্র। মৃতের পাহাড় ডিঙিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে তার অন্তহীন পথ পরিক্রমা—

“মৃত বেহলার ছড় থেকে

ছিটকে বেড়িয়ে আসা

উচ্ছিন্ন বিষাদের গান শুনতে শুনতে

হেঁটে যাচ্ছে আত্মবাহক—”^{১৭}

কবি আসলে মৃত্যু নিয়ে ভাবিত নন খুব বেশি। মৃত্যুকে পাশে রেখে কর্মের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি। মৃত্যু চিরন্তন, তা ছিল, আছে এবং থাকবে। দেহধারী জীবের উচিত তাই কর্ম করে এগিয়ে যাওয়া। তাছাড়া তিনি এও দেখেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাস গড়ে উঠেছে কোটি কোটি মৃত্যুত্তীর্ণ প্রাণের বিনিময়ে। ‘ক্লান্ত ঘুমোবার আগে’ কবিতায় তিনি তাই লিখেছেন—

“প্রতিদিন শস্যক্ষেত্রে

আগে মৃত্যু, পরে উৎপাদন”^{১৮}

এ কবির সহজ স্বীকারোক্তি। সমাজে যতই জরা-মৃত্যু আসুক— তাকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। কারণ চলমানতাই জীবনের ধর্ম। সমীর চক্রবর্তী সেই চলমান জীবনেরই মালা গাঁথেন কবিতায়।

কবিতার আর্টের ব্যাপারে পাঁচের দশকে লিখতে আসা তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে সচেতন কবি সমীর চক্রবর্তী। তিনি আধুনিক কবিতার রীতিটি খুব ভালোভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় গল্পধর্মিতা বর্জিত হয়েছে। বাম রাজনীতির সক্রিয় সদস্য হয়েও তিনি কবিতায় থেকেছেন পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক। ফলে তাঁর কবিতা কখনো কোনো ইজম বা মতবাদের প্রচারক হয়নি। সমকালীন সমাজ, রাজনৈতিক কূটাভাস ও নিপীড়িত মানুষের মর্মস্তম্ভ বেদনা তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছে অথচ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। কারণ, তাঁর কবিতার বাচন প্রতীকায়িত, ব্যঞ্জনা লক্ষণাকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে সচেতন মননচৈতন্য। ক্রমাগত নির্মাণ ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি যে কাব্যশৈলী নির্মাণ করেছেন তার পিছনে রয়েছে গভীর অধ্যবসায়। সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

“কলেজে পড়ার প্রথমদিকে জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আমি তাঁকে আমার কবিতা পড়তে দিই। উনি বললেন, তোমার সব ঠিক আছে, কেবল পোষাকটা পাল্টাতে হবে, কোলকাতার কবিদের সাথে তোমার তফাৎ কেবল পোষাকের। সেই থেকে আমি কবিতার পোষাক সম্পর্কে খুব সচেতন।”^{১৯}

সমীর চক্রবর্তীর কবিতায় বর্ণনার বিস্তৃতি রয়েছে কিন্তু গল্পধর্মিতা তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। তাঁর কবিতাবিশ্বের কথক যেহেতু স্বয়ং তিনিই, সেক্ষেত্রেই তিনিই বক্তা পুরুষ বা উত্তমপুরুষ। কিন্তু সেই কাহিনীতলে তাঁর কেন্দ্রীয় উপস্থিতি সবসময় নেই। ফলে আখ্যানের প্রকৃত সময় ও বর্ণিত সময়ের মধ্যে দূরত্বজনিত ব্যবধান যেমন রয়েছে,



তেমনি আখ্যানকথক কাহিনিতলের কোনো চরিত্রও হয়ে ওঠেনি। শৈলীর এই অবস্থান তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান স্বাপেক্ষে। কোনো কবিতায় আখ্যানতলে তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি যেমন টের পাওয়া যায় তেমনি কোনো কোনো কবিতায় রয়েছে তাঁর প্রকট উত্তমপুরুষ উপস্থিতি। শৈলীর এই ভিন্নধর্মী অবস্থান থেকে কবির নির্বাচন এখানে গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম কাব্য ‘হলুদ ঘাসের অমনিবাসে’র সামাজিক অভিঘাতজনিত কবিতাগুলিতে প্রথমোক্ত নির্বাচনরীতি গৃহীত হয়েছে। আখ্যানকথক হলেও আখ্যানতলে কবির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই—

“মসৃণ পায়ে দিয়েছিলে পথ পাড়ি
তখনও তরাইয়ে নামেনি বৃষ্টিধারা
শাল শিমুলের বে-পরোয়া নামজারী
পাথুরে নদীতে জোনাকির পাখনারা”^{২০}

‘সময় হলেই যার জন্যে যেমন’, ‘স্কেচ’, ‘মুখ দেখে যাবো লুসিফেরিনের আলোয়’, ‘হেড অফিস: জেরো জেরো ওয়ান প্লাটফর্ম’, ‘বনপাল জানে সব কথা’, ‘চাঁদের বাজারে’, ‘জলপ্রপাত নিরুদ্দেশ’ ইত্যাদি কবিতার গঠনশৈলীতে উক্ত রীতি গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে প্রেম, প্রকৃতি, বিপন্নতা, মৃত্যু, শিল্পভাবনা বিষয়ক মানবিক অনুভূতিগুলির প্রকাশে আখ্যানতলে সর্বজ্ঞ কথকের স্পষ্ট উপস্থিতি টের পাই—

“বিকেলের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছি
এ সময় সমস্ত পুরুষ
কড়ি খেলতে ভালোবাসে”^{২১}

‘এই কালবেলা’, ‘নিছক প্রেমেরই জন্যে’, ‘হলুদ ঘাসের অমনিবাসে’, ‘তুমি কি প্রেমিক থাকো’, ‘আমার বুকের মধ্যে বন’, ‘আমি বিপন্ন এখন’, ‘ভয়ের প্রার্থনা তুলে ধরি’ ইত্যাদি কবিতায় আত্মকথনরীতির আশ্রয় নিয়েছেন কবি। ‘শীত ও ক্ষুধার গল্প’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম থেকেই কবি সর্বজ্ঞ কথনের রীতি গ্রহণ করেছেন। ‘আত্মধিকারের কবিতা ১’, ‘চিঠি’, ‘খরাদিনের বর্ণলিপি-১’, ‘শীত ও ক্ষুধার গল্প’, ‘খরাদিনের বর্ণলিপি-২’, ‘বর্ণমালা : ডুয়ার্স’, ‘যৌথ কারিগর যেন আমি ও পাহাড়’, ‘গ্রহণ’, ‘মুণ্ডুহীন উপত্যকা’ ইত্যাদি কবিতার গঠন আত্মকথনরীতির। তবে আত্মকথনের নিহিত শিথিলতা মাঝে মাঝেই তাঁর কবিতাগুলিকে আক্রান্ত করেছে।

সমীর চক্রবর্তীর ‘হলুদ ঘাসের অমনিবাসে’ এবং ‘শীত ও ক্ষুধার গল্প’-এর কবিতাগুলিতে বর্ণনার আতিশয্য রয়েছে। তাঁর কবিতা আধিবাচনিক স্তর থেকে ধীরে ধীরে পরিবেশ ও পরিস্থিতির বুনোটে নির্মিত হতে হতে নির্দেশাত্মক পথে এগোতে থাকে। গড়ে উঠতে থাকে একটা সম্পূর্ণ থিম— যাতে মনোলোগ, নাটকীয়তা, ফ্ল্যাশব্যাক, নিরীক্ষণ, মিশ্রকথন একত্রে মিশে থাকে। কথনরীতির উক্ত নির্বাচন থেকে সরে এসেছেন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘হেঁটে যাচ্ছে আত্মবাহক’-এ। পূর্ববর্তী কাব্যের বাহুল্যবর্জিত সংহত কবিতার রূপ পেলাম এখানে—

“মৃত বেহলার ছড় থেকে
ছিটকে বেরিয়ে আসা
উচ্ছিন্ন বিষাদের গান শুনতে শুনতে
হেঁটে যাচ্ছে আত্মবাহক—
প্রাচীন মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি তরঙ্গের ওপর দিয়ে
তার জন্মভূমির দিকে”^{২২}

পাঁচের দশকের উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতার রোমান্টিক যাপন, সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা, আনন্দ-অশ্রু মেশানো লিরিক রীতির আদর্শ বা নর্ম থেকে স্বেচ্ছায় সরে এসে ক্রমাগত বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার নির্মাণ করলেন সমীর চক্রবর্তী।

সমীর চক্রবর্তী এই দশকেরই একজন উল্লেখযোগ্য কবি, যিনি কবিতার শৈলী সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিলেন। তিনি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত এক সংকর ভাষাশৈলী নির্মাণ করলেন কবিতায়। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া অনুসর্গ,



ক্রিয়াবিশেষণ সহ যাবতীয় কাব্যিক শব্দের নির্বাচনকে তিনি প্রত্যাহার করলেন। ব্যাকরণ পদের কাব্যিক গঠন পরিহার করলেন। শুধুমাত্র পদ গঠন বা পদ নির্বাচন নয়, অশ্বয়ের ক্ষেত্রেও কাব্যভাষার নিয়মকে পরিহার করে কবিতার ভাষাকে গদ্যের ঋজু কাঠামোয় দৃঢ় করার প্রয়াস দেখা গেল তাঁর কবিতায়। ‘আমি বিপন্ন এখন’ কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো তাঁর কাব্যভাষার পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে—

“যেহেতু রৌদ্রের ঝড়ে দুম্বে যায় মানবিক শব্দ, প্রয়োজন
যেখানে যা কিছু চারু, সিজ ও সৌরভ, সবকিছু
আমাদের জন্য তাই নিরিবিলি উদ্ধৃত আড়াল
কিন্মা ছায়া; ছায়ার অভ্যন্তরে স্থিত যাহা—
স্বাভাবিক নৈঃশব্দ—, সে সব; কিন্মা
এ মুহূর্তে সম্মোহন ছাড়া কোনো প্রার্থিত
বিষয় নেই”^{২০}

এই ভাষা নির্মাণে সুধীন্দ্রনাথের প্রভাব কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে কবির বিপন্নতা এর প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠেছে। ‘যেহেতু’, ‘কিন্মা’, ‘যাহা’ ইত্যাদি সমুচ্চরী অব্যয়ের অধিক গুরুত্ব এবং পদ গঠনের স্বাভাবিক ক্রমটিকে পরিহার করা, আসলে কবির বিপন্নতার সুরটিকেই ধ্বনিত করেছে। কবির বিপন্নতা এখানে সামাজিক অভিঘাত সঞ্জাত। সামাজিক অভিঘাতে কবির হৃদয়ে স্থিত মানবিক ম্লিঙ্কতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কবির অভীক্ষা তাই একটু আড়াল বা নৈঃশব্দ। এইভাবে বিষয় ও রীতি উভয় দিক থেকেই উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতায় আধুনিক কবিতার সূত্রপাত ঘটেছিল সমীর চক্রবর্তীর হাত ধরে।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, ২০০৯, জলপাইগুড়ি জেলা কবিতা সংখ্যা, সপ্তদশ বর্ষ, পৃ. ১০৫
২. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৪, হলুদ ঘাসের অমনিবাসে, পৃ. ৮
৩. তদেব
৪. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৪, শীত ও ক্ষুধার গল্প, পৃ. ৬
৫. তদেব, পৃ. ৭
৬. তদেব
৭. তদেব, পৃ. ৪
৮. তদেব, পৃ. ২২
৯. তদেব
১০. তদেব, পৃ. ২৩
১১. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৪, হলুদ ঘাসের অমনিবাসে, পৃ. ২৮
১২. তদেব, পৃ. ২০
১৩. তদেব, পৃ. ২১
১৪. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৪, হলুদ ঘাসের অমনিবাসে, পৃ. ১৮
১৫. তদেব, পৃ. ১৯
১৬. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৪, হলুদ ঘাসের অমনিবাসে, পৃ. ৫৩
১৭. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৭, হেঁটে যাচ্ছে আত্মবাহক, পৃ. ১১
১৮. তদেব, পৃ. ৪৯
১৯. চক্রবর্তী, সমীর, ২০০৯, জলপাইগুড়ি জেলা কবিতা সংখ্যা, সপ্তদশ বর্ষ, পৃ. ১৪৬

২০. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৪, হলুদ ঘাসের অমনিবাসে, পৃ. ১৩
২১. তদেব, পৃ. ৭
২২. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৭, হেঁটে যাচ্ছে আত্মবাহক, পৃ. ১১
২৩. চক্রবর্তী, সমীর, ১৯৮৪, হলুদ ঘাসের অমনিবাসে, পৃ. ৪৭